আমার স্বপ্ন আমার জীবন

খোলা জানালা দিয়ে কোশিগায়া পার্কের নিউ ইয়ারস ইভের ফায়ার ওয়ার্ক্স দেখছিলাম। ক্যাম্পবেলটাউন হসপিটালের ক্যান্সার রুগীদের এক বেডরুমে শুয়ে আছি। রাতের আকাশ ফায়ার ওয়ার্ক্সের আলোতে ঝলমল। পার্কে এখন নিশ্চই অসংখ্য মানুষ আর শিশুদের ভীড়; চারিদিকে আলোর ঝলকানি আর সবার মনে বইছে আনন্দের জোয়ার । কোশিগায়া পার্ক আমার খুব প্রিয় স্পট। এখানে আমরা অনেক পিকনিক, জন্মদিন ও বারবিকিউ করেছি। প্রতি বছর নিউ ইয়ারস ইভে আমরা চার ভাই-বোন আর এক দংগল ভাগ্না-ভাগ্নি ভাতিজা-ভাতিজি পার্কে বসে ফায়ার ওয়ার্ক্স দেখি। আমি কি আবার সবার সাথে পার্কে বসে ফায়ার ওয়ার্ক্স দেখতে পাব! জানিনা। ক্যান্সার আমাকে নিঃশ্বেষ করে দিচ্ছে ধীরে ধীরে। আমার দিনগুলো কি ফুরিয়ে আসছে!ফেলে আসা দিন গুলোর কথা ভূলতে পারিনা।

সেটা ১৯৯৪ সাল, আমি আর শুভ সবে মাত্র অস্ট্রেলিয়া এসেছি, ওলংগং-এ থাকি। সিডনীতে এসে সেই প্রথম নিউ ইয়ারস ইভের ফায়ার ওয়ার্ক্স দেখি হারবার ব্রিজে। সে সময় ফায়ার ওয়ার্ক্স হয়তো আজকের মত এতটা জমজমাট ছিলনা, কিন্তু আমরা তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিঃ পড়াশুনা শেষে দুজনের চাকরী, আমাদের সন্তান, ছোট একটা বাড়ী। নিউ ইয়ারস ইভের ফায়ার ওয়ার্ক্সের আলোর ছটায় আমাদের স্বপ্নগুলো জ্বলে উঠল আর আতশ বাজির পথ বেয়ে ছুটে যেতে চাইল আকাশ পানে।

হারবার ব্রিজের ফায়ার ওয়ার্ক্সের জৌলুস দিন দিন বেড়েছে, যখন আমাদের স্বপগুলো কে সংগী করে কঠিন বাস্তবতার সাথে লড়াই করছি। আমি আমার স্বপ্নগুলোকে কখনও মরতে দিইনি। দেশত্যাগী প্রবাসীদের স্বপ্ন মরে গেলে তাদের বাঁচার অবলম্বন থাকেনা। প্রথম নিউ ইয়ারস ইভের ফায়ার ওয়ার্ক্স আমাদেরকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তাই এর স্মৃতি হৃদয়ে সবসময়ই জ্বলজ্বল করত।

সাউথওয়েস্টার্ন সিডনীর টুঙ্গাবীতে তে মুভ করলাম ১৯৯৯-এর জানুয়ারীতে। ইতিমধ্যে আমরা দুজন বিজন্যাস স্টাডীসে ডিপ্লোমা নিয়েছি। বেশ কয়েকটা ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স শেষ করে শুভ চাকরী খুঁজছে। আমি তখন মা হবার জন্য পৃথিবীর সব কিছু ছেড়ে এক প্রানান্তকর সাধনায় লিপ্ত; বছরের মাঝামাঝি মাতৃত্বের বারতা এল। দেহ-মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে মাতৃত্ব কে বরন করে নেবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আম্মাকে এসময় পাশে পেয়ে অনেক আশ্বস্ত হলাম।

দুহাজারের মে তে আমি মা হলাম। আমার প্রথম সন্তান সুমিত এল কোল জুড়ে। এত দিনের দূখ্য কস্ট্য সব ভূলে গেলাম। আমি সুমিতকে কোথায় রাখি! কোলে, কাঁখে, বুকে; আমার এত সাধনার ধনকে কোথায় রেখে শান্তি পাইনা। ওকে সারাদিন সাত রাজার ধনের মত কাছে আগলে রাখি। আমার মাতৃত্বের নদীতে যেন জোয়ার এসেছিল,

সুমিতের বয়স এক বছর পার হতেই আমি আবার মা হলাম। এবার পুতুলের মত এক মেয়ে পেলাম, আরীবা। আমার কপালে এত সুখ কি সইবে!

আমাদের বৃহত্তর পরিবারের কলেবর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মেজদা প্রথম অস্ট্রেলিয়া আসেন ১৯৮৩-তে; মেজপা এল বিরানব্বই-এ, তারপর সেজদা ও আমি। বরপা ও দুলাভাই অস্ট্রেলিয়া এল ২০০২-এর জানুয়ারীতে, সাথে তাদের দু ছেলে কমল ও অনীক। আমি যখন ঢাকা ছিলাম, অস্ট্রেলিয়া তখনও আসিনি, থাকতাম আমরা মধুবাজারে; বরপা ও দুলাভাই থাকতেন কাছেই রায়েরবাজারে। দুজনেই চাকরী করতেন। ভার্সিটিতে আমার তেমন ক্লাশ থাকতনা। বাসায় ফিরে কমলকে নিয়ে আসতাম। কমলকে নিয়ে খেলতাম, ওকে কথা শিখাতাম ; ওকে শিখিয়েছিলাম আমাকে মুন্নীমা বলতে। কমলের মুন্নীমা ডাক আমার সব ভাগ্না-ভাগ্নি ভাতিজা-ভাতিজি ভাগ করে নিল। আমি হয়ে গেলাম ওদের সবার আবদারের মুন্নীমা।

বরপা আসার কিছু দিন পর সেজদা ব্রিসবেন থেকে সিডনী চলে আসলে আমরা চার ভাই-বোন এক সাথে হলাম। আমরা ভাই বোন , এক গাদা ভাগ্না-ভাগ্নি ভাতিজা-ভাতিজি সাউথওয়েস্টার্ন সিডনীর বিভিন্ন সাবার্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও সপ্তান্তে কোন উছিলায় সবাই জড় হতাম। গেট-টুগেদার, বার্থডে পার্টি, ফাঁকে ফাঁকে সিডনীর বাইরে লংড্রাইভে যাওয়া, বারবিকিউ করা-এ সব কিছুতে আনন্দে দেহ-মন ভাসিয়ে জীবন চলে যাচ্ছিল।

দুহাজার দুই-এর এপ্রিলে আমি আর শুভ চলে এলাম ক্যাম্পবেলটাউন শহরতলীর লুমিয়া তে। ওখানে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে কেনা দুবেড-এর এক ভিলাতে বাসা বাঁধলাম। শুভর চাকরী তখন নড়বড় করছে, এদিকে সুমিত আরীবা বড় হচ্ছে। শুভকে বললাম ভয় করণা। আমি আবার কোর্স করব, একটা চাকরী জুটিয়ে নেব, দরকার হলে তুমি আরীবা সুমিত কে দেখবে। আমাদের দিন কি বদলাবেনা! ২০০৩-এর শেষ দিনে প্রথম কোশিগায়া পার্কে নিউ ইয়ারস ইভের ফায়ার ওয়ার্ক্স দেখতে গেলাম সব ভাই-বোন আর ভাগ্না-ভাগ্নি ভাতিজা-ভাতিজি মিলে। আকাশে আঁতশ বাজি বিস্ফোরিত হয়ে ছুটে ছুটে যাচ্ছে, সবার চোখ মুখ খুশীর আনন্দ ঝলমল, ছুটোছুটি করছে হাজার শিশু। সুমিত আরীবা যেন আনন্দে ফেটে পড়ছিল আর মিশে যেতে চাইছিল শিশুদের ভীড়ে। ফায়ার ওয়ার্ক্স-এর আলোতে আরীবা সুমিত কে নিয়ে আমি নুতন স্বপ্ন দেখতে লাগলামঃ ওরা বড় হবে, স্কুলে যাবে, তারপর.....

আমার স্বপ্নের পিদিমগুলো জ্বালিয়ে রাখতে যেয়ে আমি নিজেকে বোধহয় পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিলাম। কখন যে দেহে মরণ ব্যাধি ক্যান্সার বাসা বেধেঁছিল জানতে পারিনি। যখন পারলাম, তখন দেরী হয়ে গেছে। নিজেকে বড় অসহায় মনে হল; নিষ্ঠুর বিধাতার কাছে ফরিয়াদ জানালামঃ আমাকে এত কিছু দিয়ে আবার আমাকে নিঃস্ব করে দিতে চাইছ কেন! আমাকে আর পাঁচটি বছর বাঁচিয়ে রাখ-আরীবা সুমিত কে আমি একটু বড় করে

দিয়ে যেতে চাই। তারপর আমাকে এই বিশ্বসংসার থেকে ছুটি দিয়ে দিও। আমার কোন দুঃখ থাকবেনা।

জীবনের শেষ দুটি বছর জীবন-মৃত্যু, আশা-নিরাশা, সুস্থতা-অসুস্হতা, অস্ত্রোপচার, কেমোথেরাপীর পাশ্বর্প্রতিক্রিয়া-এ সবের দোলাচলে আমি যেন ডুবন্ত মানুষের মত বানের জলে ভেসে চলছিলাম। কখনো তলিয়ে যাচ্ছি, আবার মা ভাই বোনদের অপার ভালবাসা আর সেবা শশ্রুষা কে অবলম্বন করে বাঁচার চেস্টা করেছি। আরীবা সুমিত কে ঘিরে আমার প্রবল জীবন তৃষ-া যেন বার বার বলেছে তুমি হারবেনা, হারতে পারনা-তোমার প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। আরীবা সুমিত-এর জন্য বেঁচে থাকার লড়াই শেষ পর্যন্ত করে গেছি, কিন্তু এ বড় অসম লড়াই, তাই হেরে গেলাম। মনে হল এ পৃথিবীতে এসেছি এই সেদিন আর কয়েক দিন কাটিয়ে এক অসীম বেদনা নিয়ে চলে যাচ্ছি।

ক্যাম্পবেলটাউন হসপিটালের বেডে শেষ বারের মত যখন এলাম, তখন আমার বাবা-মা সবভাই-বোন আমার চারপাশে। সবাই মুষড়ে পড়েছে, চোখে মুখে সবার প্রচন্ড বেদনার ছাপ। আমি আরীবা সুমিতের কথা ভাবছিলাম, ওদের কচি নরম হৃদয়ে আমার স্মর্তি জেগে থাকবেত! ওদেরকে আমার মত করে আমার ভাই-বোনেরা ভালবাসতে পারবেত!শুভর জন্য আমার ভীষন কস্ট্য হচ্ছিল।

ভোর হয়ে আসছে। কোশিগায়া পার্কের ওধারে পাহাড়ের চূড়ায় আকাশে নতুন বছরের সূর্য্য। মেঘে মেঘে ছড়িয়ে পড়েছে প্রথম আলোর রক্তিম আভা। রাতে ঘূমাতে পারিনি, এরকম অনেক নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে আমি ভীষন ক্লান্ত। বিধাতা আমাকে অন্তহীন পরম শান্তির এক নিদ্রা দাও। আমার আরীবা সুমিত কে তুমি দেখ।

পাদটীকাঃ ফরিদা হাসান মুন্নী ২০০৮-এর ২৬শে জানুয়ারী ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃতুবরন করেন। আজ এই দিনে তার স্মৃতি আমরা মুন্নীর ভাই বোনেরা স্নেহ-মায়া ভরে স্বরন করছি - ফারুক কাদের